

এ কী দুর্দৈব!

মন জুরে মওলা

রাষ্ট্রদূতও নিরাপদ নন

এ কথা প্রায় নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এক সাধক পুরুষ যেখানে সমাহিত আছেন, সেখানে কিছুদিন আগে বোমা বিস্ফোরণের যে ঘটনাটি ঘটল, তার উদ্দেশ্য ছিল এ দেশে নিযুক্ত একজন রাষ্ট্রদূতকে হত্যা করা। ঘটনাটি আকস্মিকভাবে ঘটেনি, কিংবা, ওই রাষ্ট্রদূত আকস্মিকভাবে বোমা-হামলার ঘটনার শিকার হননি। বোমাটি তাঁকে লক্ষ্য করেই ছোড়া হয়েছিল, তাঁর গায়ে আঘাত করেছিল, আঘাত করার পর ছিটকে পড়েছিল, এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি কয়েক পা এগিয়ে গিয়েছিলেন এবং এগিয়ে যাবার ফলেই নিহত হওয়া থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন। এ বেঁচে যাওয়াটা বিস্ময়কর। পরম করুণাময়ের অশেষ রহমতের কারণেই এটি সম্ভবপর হয়েছে। ওই রাষ্ট্রদূত নিহত হতে পারতেন এবং যদি তিনি তা হতেন, তাহলে এ ঘটনা আরও তীব্র আকার ধারণ করত। কিন্তু এ ঘটনার মূল তাৎপর্য এখন যা আছে, তখনও তা-ই থাকত। এ তাৎপর্য এই যে, আমরা একজন রাষ্ট্রদূতের-যিনি এ দেশে একজন সম্মানিত অতিথি-নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারিনি। এ তাৎপর্য এই যে, এর আগেও এ ধরনের ঘটনা ওই একই জায়গায় ঘটার পরেও আমরা সাবধান হইনি বা সাবধান হবার প্রয়োজনবোধ করিনি। এ তাৎপর্য এই যে, সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটাতে যারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তাদের দমন করতে সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ। এ তাৎপর্য এই যে, এ দেশে এখন কেউই নিরাপদ নয়। ওই রাষ্ট্রদূতকে সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, তারপর অতি দ্রুত তাঁকে রাজধানী ঢাকায় নিয়ে আসা হয়েছে এবং কিছুটা সুস্থ হবার পর তিনি চিকিৎসার জন্য তাঁর নিজ দেশে ফিরে গেছেন। ওই দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। এই রাষ্ট্রদূত মাত্র কিছুদিন আগে এ দেশে তাঁর দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আসলে এ দেশেরই মানুষ, এ দেশেই তাঁর জন্ম হয়েছিল। পরে তিনি অন্য দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন এবং সে দেশের প্রতিনিধি হিসাবে এ দেশে আসেন। এমনি ঘটনা বাংলাদেশের ইতিহাসে আর কখনও ঘটেনি। তাঁর নিয়োগের দিক থেকে ওই রাষ্ট্রদূত তাই ব্যতিক্রমী ছিলেন। সন্ত্রাসীদের হাতে আক্রান্ত হয়ে তিনি আবারও ব্যতিক্রমী হয়ে গেলেন। তাঁর চিকিৎসার জন্য দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করায় তাঁর দেশ বাংলাদেশ সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছে। এটি কূটনৈতিক শিষ্টাচারের মধ্যে পড়ে। কিন্তু বাংলাদেশ সম্পর্কে ওই দেশের দীর্ঘদিনের ধারণা এই ঘটনার পর মারাত্মকভাবে পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে এবং, যদি তা হয়, তাহলে তার মূল্য বাংলাদেশকেই দিতে হবে। ওই রাষ্ট্রদূতকে লক্ষ্য করে যা ছোড়া হয়েছিল, সাধারণ ভাষায় তাকে বোমা বলা হলেও আসলে তা ছিল গ্রেনেড। গ্রেনেড বলেই এটি বিস্ফোরিত হতে কয়েক সেকেন্ড সময় লেগেছিল। গ্রেনেড এমনভাবেই বানানো হয় যে, বিস্ফোরিত হতে এই সময়টুকু যেন লেগে যায়, যে গ্রেনেডটি ছুড়ছে, সে যেন নিরাপদ থাকে। সাধারণ বোমা আর গ্রেনেড এক কথা নয়। যে বা যারা এ গ্রেনেডটি ছুড়েছে, সে বা তারা এটি পেল কোথায়? গ্রেনেড সমরাস্ত্র। সাধারণভাবে এটি পাওয়া কিংবা ঘরে বসে এটি বানানো সম্ভবপর নয়। স্বভাবতই এ সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, যারা এটি ছুড়েছে, তাদের সঙ্গে কোন জঙ্গী সংগঠনের সম্পর্ক আছে বা কোন এক সময় ছিল। বিদেশে এ ধরনের জঙ্গী সংগঠন তো আছেই। তারা তাদের কার্যক্রম গোপন করে না এবং সে-কার্যক্রমের জন্য দায়িত্ব স্বীকার করে নেয়। এ ধরনের কোন সংগঠনই কি এ ঘটনা ঘটিয়েছে? কিন্তু, কেন? ওই সব বিদেশী সংগঠনের বাংলাদেশে সক্রিয় হবার কোন কারণ আছে বলে মনে হয় না। এটি যদি না হয়, তাহলে ধারণা করতে হবে যে, এ দেশেই জঙ্গী সংগঠন আছে। সে সংগঠনের কাছে অস্ত্র আছে এবং সে সংগঠনের সদস্যরা এসব অস্ত্র ব্যবহারে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। সরকার তাহলে কি করছে? এ ধরনের সংগঠন দেশে থাকে কি করে? যদি থাকে, সরকার তার খোঁজ পায় না কেন? যদি পায়, সেগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয় না কেন? বাংলাদেশ কি তাহলে এক ধরনের সন্ত্রাসী রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়ে গেছে কিংবা হতে যাচ্ছে? এই যে মাঝেমধ্যে অবৈধ অস্ত্রের বিপুল চালান ধরা পড়ে, সেগুলো যায় কোথায়? কে বা কারা আনে? যারাই আনুক, তারা ধরা পড়ে না কেন? এই ঘটনার সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত নয়, এমন একটি বিষয়ও বিবেচনা করা যেতে পারে। সেটি হলো সাম্প্রতিককালে দেশের উত্তরাঞ্চলে একটি মৌলবাদী সংগঠনের তৎপরতা। এই সংগঠনটি তার অপছন্দের লোকজনকে মৃত্যুদণ্ড দিচ্ছে এবং প্রকাশ্যে শোভাযাত্রা করে তার দণ্ড প্রকাশ করছে। সরকার-প্রধান নাকি এ সংগঠনের নেতাকে গ্রেফতার করার নির্দেশ দিয়েছেন। সে-নির্দেশ এখনও পর্যন্ত কার্যকর হয়নি। হতে পারে ওই সংগঠন যাদের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে, তারা খুবই মন্দ লোক। তার পরেও তাদের মৃত্যুদণ্ড দেবার কোন অধিকার ওই সংগঠনের নেই। এই ধরনের কোন সংগঠন যদি দেশে অপ্রতিহতভাবে কাজ করতে পারে, তাহলে অন্য সন্ত্রাসী সংগঠনসমূহও উৎসাহিত বোধ করবে। যে পরিস্থিতিতে দেশে সন্ত্রাস দমন করা সম্ভবপর বলে মনে করা যায়, সে পরিস্থিতি, দুর্ভাগ্যবশত, দেশে বিরাজ করছে না। এ কারণেই কি ওই রাষ্ট্রদূতের ওপর হামলা সম্ভবপর হয়েছে? একটি আইন-শৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনীর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, ওই বাহিনী ওই রাষ্ট্রদূতের কর্মসূচী সম্পর্কে অবহিত ছিল না। এটি কি করে সম্ভব? যখনই কোন রাষ্ট্রদূত রাজধানীর বাইরে কোথাও যান, তিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে সে বিষয়ে অবহিত করেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে ওই রাষ্ট্রদূতের কর্মসূচীর কথা জানিয়ে দেয়। তখন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব হয়ে পড়ে রাজধানীর বাইরে ওই রাষ্ট্রদূতের নিরাপত্তা বিধান করা। বর্তমান ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়ার কোন ব্যতিক্রম হবার কোন কারণ নেই। তাহলে ওই আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কি করে বলে যে, ওই বাহিনী ওই রাষ্ট্রদূতের কর্মসূচী সম্পর্কে অবহিত ছিল না? নাকি, ওই বাহিনী এই কর্মসূচীর কথা জানত ঠিকই, কিন্তু তা গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেনি? ওই ঘটনার পর-পরই কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়। এরা প্রধান বিরোধী দলের কর্মী বা সমর্থক। কোথাও কোন সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটলেই প্রধান বিরোধী দলের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করা যেন প্রথায় দাঁড়িয়ে গেছে। এমনটি হলে সুষ্ঠু তদন্ত আশা করা যায় না। এ দিকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত প্রতিমন্ত্রী বলেছেন, ‘প্রকৃত অপরাধী ধরার আগে রাজনৈতিক লিঙ্ক খোঁজার কোন দরকার নেই। সত্যিকারের অপরাধীকে গ্রেফতার করুন’ (‘জনকণ্ঠ’, ২৪-০৫-২০০৪)। এর মানে কি এই যে, আগে প্রকৃত অপরাধী ধরার আগে ‘রাজনৈতিক লিঙ্ক’ খুঁজে দেখা হতো? এ অবস্থার নিরসন যত তাড়াতাড়ি হয়, ততই ভাল।

আসন্ন বাজেট

বিদেশ নির্ভরতা না আত্মনির্ভরশীলতা?

আতিউর রহমান

আর কয়েকদিনের মধ্যেই সামনের অর্থবছরের জন্য সংসদে বাজেট পেশ করবেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী। এরই মধ্যে তিনি বিভিন্ন পেশাজীবী গোষ্ঠী, এনজিও, অর্থনীতিবিদ, সংসদ সদস্য ও ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের সঙ্গে আলাদা আলাদাভাবে সংলাপ করে চলেছেন। উন্নয়ন ভাবনায় বিভিন্ন মহলের মতামত নেবার এই সংস্কৃতিটি ধীরে ধীরে হলেও দানা বাঁধছে। আগের সরকারের আমলে শুরু হলেও প্রাক-বাজেট আলোচনার এই উদ্যোগটি যে বর্তমান সরকারের আমলেও চালু রাখা হয়েছে তাতেই আমরা সন্তুষ্ট। নীতির ক্ষেত্রেও এই ধারাবাহিকতা রক্ষা করা গেলে আরও ভাল হতো। কিন্তু আমাদের এমনি দুর্ভাগ্য যে, সরকারী ও বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দের মুখ দেখাচ্ছেই প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। সে কারণে সংসদ অকার্যকর হয়ে পড়ে আছে। দেশের দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র প্রণয়নের সময়েও বিরোধী দলের মতামত গ্রহণ করা হচ্ছে না। এমন ইস্যুতেও জাতীয় ঐকমত্য নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। এবারের বাজেট হবার কথা পিআরএসপি ভিত্তিক। সত্যিই কী তা হচ্ছে? এমন পরিবেশে সুশাসন, উন্নয়নের স্বদেশায়ন এবং জাতীয় নীতিকৌশল গ্রহণের মতো কথাবার্তা খানিকটা অপ্রাসঙ্গিকই মনে হতে পারে। তারপরেও নাগরিক সামাজের পক্ষ থেকে এ বিষয়গুলো দেশবাসীর কাছে তুলে ধরার প্রয়োজন রয়েছে বলে আমি মনে করি। সমাজ ও রাজনীতিতে যে অস্থিরতা এবং রক্তক্ষরণ চলছে তাতে দেশবাসী সত্যি উদ্দিগ্ন। সমূহ সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও একটি দেশ শুধুমাত্র শক্তিশালী, সুবিবেচক, দেশপ্রেমিক নেতৃত্বের অভাবে কী করে হতাশায় নিমজ্জিত হতে পারে বাংলাদেশ তার এক উজ্জ্বল উদাহরণ হতে পারে। আশপাশের দেশ যখন নিজেদের সকল দুর্বলতা সুশাসন নিশ্চিত করার পথে দৃঢ়চিহ্নে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তখন আমরা প্রতিহিংসা, দুর্নীতি এবং সহিংসতার রেকর্ড করে যাচ্ছি। আর সে কারণে, বিদেশীরা সুযোগ পেয়ে আমাদের সর্বক্ষণ শলাপরামর্শ দিয়ে যাচ্ছে। লজ্জাশরমের মাথা খেয়ে আমরা বারে বারে তাদের কাছেই আমাদের দৈন্য প্রকাশ করে যাচ্ছি। উন্নয়নের জন্যে নিঃসন্দেহে বিদেশী সাহায্য প্রয়োজন। তাই বলে যে কোন শর্তে, যে কোন মূল্যে বিদেশী সাহায্য গ্রহণের জন্যে মরিয়া হবার প্রয়োজন রয়েছে বলে আমি অন্তত মনে করি না। আমাদের দেশটাকে যদি আমরা চিনে থাকি তাহলে স্বদেশের জন্যে স্বাধীন শক্তিতে কাজ করবার মতো মানুষের অভাব নেই। তারা নানাভাবে নানাক্ষেত্রে স্বদেশের উন্নয়নে কাজও করে যাচ্ছেন। কিন্তু তাদের এই সৃজনশীল প্রচেষ্টাসমূহকে যথার্থ মদদ দেবার মতো সহায়ক নীতি পরিবেশ আমাদের নীতিনির্ধারণকারী তৈরি করে দিতে পারছেন না। নিজেদের ওপর ভরসা রেখে স্বদেশের কৃষক, শ্রমিক এবং শিল্প উদ্যোক্তাদের জন্যে সহায়ক অবকাঠামো এবং নীতি সমর্থন দেবার মতো সাহস তারা দেখাতে পারছেন না। তারা বিদেশীদের কথামতো লাভজনক পাবলিক শিল্পকেও ব্যক্তিখাতে দিতে বেশি আগ্রহী, কৃষককে কম দামে বিদ্যুত দিতে কম আগ্রহী, হতদরিদ্রকে সামাজিক সুরক্ষা প্রদানে অনুৎসাহী। তাই সংস্কারের নামে তারা বেকারত্ব বৃদ্ধি করেন, দারিদ্র্যের মাত্রা বাড়িয়ে দেন। অথচ আমরা যদি নিজের মতো করে নিজের দেশটার উন্নয়নের চেষ্টা করতাম তাহলে এমন বিড়ম্বনায় পড়তে হতো না। ভারতের নির্বাচনের ফলাফল দেখেও আমরা এ বিষয়টি বুঝতে পেরেছি বলে মনে হয় না। স্বদেশের প্রয়োজনে নিজের বুদ্ধিতে কাজ করাই যে একটি বড় লাভ সে কথাটি কী আমরা বুঝি? “দেশের জন্য স্বাধীন শক্তিতে যতটুকু কাজ নিজে করিতে পারি তাহাতে দুই দিকে লাভ-একে তো ফল লাভ, দ্বিতীয়ত নিজে কাজ করাটাই একটা লাভ, সেটা ফল লাভের চেয়ে বেশি বৈ কম নয়” (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘ছাত্রদের প্রতি সম্বাষণ’, রবীন্দ্র রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৫৯)। রবীন্দ্রনাথের এই দেশজ চিন্তা আমাদের উন্নয়ন কৌশল উদ্ভাবনে বিরাট শক্তি যোগাতে পারে। এ কথাগুলো বেশি করে মনে পড়ছে সম্প্রতি শেষ হয়ে যাওয়া বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামের সভার পর। পাঠকরা নিশ্চয় জানেন যে, কিছুদিন আগে ঢাকায় বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামের এক সভা হয়ে গেল। সেই সভায় দাতারা বাংলাদেশ সরকারের ম্যাক্রো-অর্থনৈতিক নীতি সংস্কারের খানিকটা প্রশংসা করলেও দেশ পরিচালনার নানা বিষয়ে তাদের তীব্র সমালোচনাও শুনতে হয়েছে আমাদের নীতিনির্ধারণকদের। বিশেষ করে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির বেহাল অবস্থা, দুর্নীতি দমনে ব্যর্থতা এবং এনজিওদের সঙ্গে সরকারের সম্পর্কের টানাপোড়েনের বিষয়ে প্রচুর কথাবার্তা শুনতে হয়েছে সরকারকে। একাধিক মন্ত্রীকে দাতা প্রতিনিধিদের সামনে দাঁড়িয়ে যেভাবে সরকারের চলমান নীতি-কৌশল নিয়ে জবাবদিহি করতে হয়েছে তাতে একজন নাগরিক হিসাবে আমার কান ঠিকই লাল হয়ে উঠেছিল। ‘গলায় গামছা বুলিয়ে এভাবে বিদেশীদের সামনে যদি আমাদের নীতিনির্ধারণকদের নতজানু হতে হয় তাহলে স্বাধীন দেশের মর্যাদা আর থাকল কতটুকু। যে কোন মূল্যে বিদেশী সাহায্য পাবার জন্যে মরিয়া হবার কারণেই বিদেশীরা আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে এভাবে প্রশ্ন করার সাহস পেয়েছে। বিদেশী সাহায্য নিই বলেই এমন করে আমাদের কথা শুনতে হচ্ছে। তবে আমরা যদি আমাদের দেয়া প্রতিশ্রুতি মতো কাজ করতাম তাহলে নিশ্চয় এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হতো না। অথচ টাকার অংকে এখন কিন্তু খুব বেশি বিদেশী সাহায্য পাই না আমরা। এক দশক আগেও আমরা আমাদের মোট জাতীয় আয়ের ছয় শতাংশের মতো বিদেশী সাহায্য পেতাম। এখন তা কমে আড়াই বা তিন শতাংশের মতো হয়েছে। এই অংক আমরা যে পরিমাণ রাজস্ব আহরণ করি তার এক-তৃতীয়াংশেরও কম। আমাদের অনাবাসী শ্রমিকরা যে পরিমাণ রেমিটেন্স পাঠান তার অর্ধেকের মতো এই অংক। এর দ্বিগুণেরও বেশি আমরা রপ্তানী আয় করে থাকি। এই সামান্য বিদেশী সাহায্যের জন্য কেন আমাদের এতো পরামর্শ বা চোখ রাঙানি শুনতে বা দেখতে হবে। যে পরিমাণ বিদেশী সাহায্য আমরা পাই তা কী আমাদের ইচ্ছেমতো খরচ করতে পারি? ওই অর্থ দিয়ে কি আমরা আমাদের পছন্দমতো দেশ থেকে যন্ত্রপাতি বা পণ্য কিনতে পারি? তা যদি না পারি তাহলে এতোটা মরিয়া হয়ে বিদেশী সাহায্য নেবার কী প্রয়োজন সত্যি সত্যি রয়েছে? এ প্রশ্নের উত্তর খুব একটা সহজ হবে না। জাতি হিসাবে আমরা যদি নিজের পায়ে আত্মসম্মান নিয়ে দাঁড়াতে না চাই, নিজেদের পকেট থেকে কর দিয়ে দেশের উন্নতি করতে আগ্রহী না হই, বিদেশী সাহায্য-নির্ভর প্রকল্পের অধীনে প্রাপ্ত গাড়ি, এসি ব্যবহার থেকে বিরত না থাকতে চাই, এসব প্রকল্পের অধীনে নির্মাণ কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাড়তি কমিশনের লোভ সংবরণ না করতে পারি তাহলে এমন করে বছর বছর আমাদের দাতাদের সামনে জবাবদিহি করে যেতেই হবে। এর মানে এই নয় যে, আমি বিদেশী সাহায্যের পুরোপুরি বিরোধী। নিশ্চয়

আমরা কম সুদের আইডিএ ঋণ নেব। তবে তা নেব আমাদের নিজস্ব পরিকল্পনা ও প্রয়োজনমার্ফিক। যে বিদেশী সাহায্য নিলে আমাদের অর্থনীতির উৎপাদনশীলতা বাড়বে, মানব সম্পদের উন্নতি হবে তা নিশ্চয় আমরা নেব। তবে সেজন্যে অপমানজনক শর্ত মানতে আমি রাজি নই। বিদেশী সাহায্য না নিলেও যেখানে আমাদের চলবে সেখানে অন্যায়্য সব শর্তে পরনির্ভরতার শেকল পরার কোন মানে হয় না। একটা সময় ছিল যখন সত্যি সত্যি আমরা আমাদের জনগণকে দু’বেলা খাবার দিতে পারতাম না। তখন বিদেশী খাদ্য সাহায্য না পেলে দুর্ভিক্ষ ছিল অনিবার্য। কিন্তু আমাদের পরিশ্রমী কৃষকরা আমাদের এই অসহায়ত্ব থেকে আমাদের মুক্তি দিয়েছেন। তারা গত তিরিশ বছরে খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণেরও বেশি বাড়িয়ে আমাদের খাদ্য সাহায্য নির্ভরতা থেকে পুরোপুরি মুক্তি দিয়েছেন। আর এখন বাণিজ্যিক ভিত্তিতেও খাদ্য আমদানি খুব বেশি পরিমাণে করতে হয় না বলে আমাদের বিদেশী মুদ্রার রিজার্ভেও সেভাবে টান পড়ে না। উপরন্তু তাদের ছেলেমেয়েরা বিদেশে কাজ করে। প্রচুর রেমিটেন্স পাঠাচ্ছেন এবং দেশের গার্মেন্টস খাতে কাজ করে। প্রচুর রফতানি আয় নিশ্চিত করছেন। আমাদের কৃষকদের এই অবদানের কারণেই আজ আমরা উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে অনেকাংশেই এগিয়ে রয়েছেি। তা সত্ত্বেও আমাদের নেতৃত্বের অদক্ষতা ও অসততার কারণে দেশে দুর্নীতির বিরাট ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে এবং সন্ত্রাস এক শিল্পে রূপান্তরিত হয়েছে। স্বাধীন শক্তিশালী দুর্নীতি দমন কমিশন, নির্বাচন কমিশন, মানবাধিকার কমিশন, বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথকীকরণের মতো প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার করতে পারিনি বলেই দেশে শাসন ব্যবস্থায় তীব্র সঙ্কট দেখা দিয়েছে। আর সে কারণেই দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের চাপ ও তাপ সমাজকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলছে। আর সে কারণেই, আমাদের দেশ পরিচালকরা যে কোন মূল্যে বিদেশী সাহায্য পেতে আগ্রহী। কেননা, উন্নয়ন বাজেট তৈরিতে লাগে বিদেশী সাহায্য। আর উন্নয়ন বাজেটটিই আমাদের অর্থনীতির ‘নরম পেট’ (সফট বেলি) অন্য কথায় তা এক ‘কালো গহ্বর; দুর্নীতির বড় আখড়া।

দাতাদের কথা যতই অপছন্দ করি না কেন এ কথাও তো ঠিক যে সর্বথাসী এই দুর্নীতি বন্ধ করা গেলে এবং দেশে ন্যায্য শাসন নিশ্চিত করে সামাজিক শান্তি আনা গেলে আমাদের জাতীয় আয় বছরে আরও তিন শতাংশের মতো বাড়ানো সম্ভব। এমনিতেও আমরা প্রবৃদ্ধির দৌড়ে খুব একটা খারাপ করছি না। কিন্তু বর্তমানের সাড়ে পাঁচ শতাংশ হারের সঙ্গে আরও তিন কিংবা আড়াই শতাংশ যোগ হলে জিডিপি বৃদ্ধির হার সহজেই আট শতাংশ নিশ্চিত করা সম্ভব। দাতারা এবারের উন্নয়ন ফোরামের সভায় নীতি নির্ধারকদের এই সম্ভাবনার কথাটি বেশ জোর দিয়েই বলেছেন। আর এই হারে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করা গেলে আমাদের দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্য পূরণ সহজ হবে। এই পথে এগুলে প্রতিবছর দুই বিলিয়ন ডলারের সমান বিদেশী সাহায্য পেতেও অসুবিধা হবে না বলে দাতারা জানিয়েছেন। অবশ্যি, শুধুমাত্র বিদেশী সাহায্য পাব বলেই আমরা এই পথে হাঁটব এমন করে বলার মধ্যেও এক ধরনের হীনম্মন্যতা প্রকাশ পায়। কেন আমরা আমাদের প্রয়োজনেই দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে একটি জাতীয় লড়াই শুরু করতে পারব না? দলমত নির্বিশেষে দারিদ্র্য নামের যমদূতের বিরুদ্ধে যদি একটি সর্বব্যাপী যুদ্ধ শুরু না করতে পারি তাহলে গরিব দেশের যে তিলক আমরা পড়ে বসে আছি তা মুছে ফেলা সহজ হবে না। দারিদ্র্য যেহেতু একটি বহুমাত্রিক বিষয়, তাই এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের ধরনও হতে হবে বহুদিক থেকে। অনেকটাই গেরিলা যুদ্ধের মতো। সাধারণের আয় রোজগার বাড়ানোর মতো আর্থ-সামাজিক পরিবেশ নিশ্চিত করার পাশাপাশি রাষ্ট্রকে কতগুলো ক্ষেত্রে মৌলিক দায়িত্ব নিতে হবে। সামাজিক শান্তির জন্যে সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে রাষ্ট্রকেই। সেজন্য আইনশৃঙ্খলার প্রভূত উন্নতি করতে হবে। সংবিধানে বর্ণিত সকলের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান নিশ্চিত করার দায়িত্বও রাষ্ট্রের। সেক্ষেত্রে একা না পারলে রাষ্ট্রকে এনজিও কিংবা ব্যক্তিখাতকে সহযোগী হিসাবে নিতে হবে। তাছাড়া, জনসংখ্যার প্রায় এক দশমাংশ মানুষের এখনও চালচুলো দুটোই নেই। নেই তাদের কোন ঠিকানা। অন্যের দয়া-দাক্ষিণ্যে তারা কোনো মতে বেঁচে আছে। মানুষ হিসাবে পরিচয় দেবার মতো আত্মসম্মানটুকুও তাদের অবশিষ্ট নেই। এদের জন্যে প্রয়োজনীয় সামাজিক সুরক্ষা প্রদানের দায়িত্ব রাষ্ট্রের। দরকার হলে ধনীর ওপর বাড়তি কর চাপিয়ে হলেও এই হতদরিদ্র মানুষের মানবেতর জীবন পরিচালনার ক্রেশ থেকে মুক্তি দেবার দায়িত্ব রাষ্ট্রের।

এমন কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য সামনে রেখেই আমরা বর্তমানে জাতীয় দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র তৈরি করার কাজে ব্যস্ত রয়েছেি। এর আগে দাতাদের চাপেই আমরা একটি অন্তবর্তীকালীন দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র তৈরি করেছিলাম। সেই পত্রটি খুবই তাড়াহুড়ে করে তৈরি করেছিলাম বলে তাতে অনেক দুর্বলতা ছিল। যাদের জন্য এই কৌশলপত্র সেই গরিব মানুষের সঙ্গে আমরা নিবিড়ভাবে আলাপ করে তৈরি করতে পারিনি। খুবই আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এই খসড়া পত্রটি তৈরি করা হয়েছে। এতে সেইভাবে রাজনৈতিক অঙ্গীকার প্রতিফলিত হয়নি। এ বিষয়ে সরকারী এবং বিরোধী রাজনীতিকদের সচেতনভাবে অংশগ্রহণের চিত্র আমাদের চোখে পড়েনি। দেশের সংসদে এ বিষয়ে গভীর কোন বিশ্লেষণ হয়নি। এমনকি মন্ত্রিপরিষদেও এ বিষয়ে দীর্ঘ আলাপ হয়েছে বলে আমরা জানি না। পার্লামেন্টারি স্থায়ী কমিটিগুলোতেও প্রতিটি খাতওয়ারী আলাপের কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। এ প্রশ্নে মিডিয়া বিতর্কও হয়েছে বলে মনে পড়ে না। একটিমাত্র এনজিওর মাধ্যমে আমন্ত্রণ করে অংশগ্রহণের যে সাজানো অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে জনগণের স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণের সুযোগ ছিল না। তাদের ভাগ্য নির্ধারিত হচ্ছে যে কৌশলপত্রে তার ওপর মতামত দেবার অধিকার গরিব মানুষসহ সকল নাগরিকের রয়েছে। সেই অধিকার প্রয়োগের সুযোগ দেননি খসড়া কৌশলপত্র প্রণেতারা। পত্রিকার মাধ্যমে তাদের মতামত চাওয়ার সুযোগ গ্রহণ করেননি কৌশল প্রণেতারা। তাছাড়া, কনসালটেশনের সংখ্যাও ছিল সীমিত। পেশা বা লিঙ্গের ভিত্তিতে নানা ধাঁচের গরিবদের মতামত নেবার যে সুযোগ ছিল তাও গ্রহণ করেননি কৌশলপত্র প্রণেতারা। তাছাড়া, সীমিত আকারে হলেও কী তাঁরা আলাপ করেছেন সে কথা দেশবাসী জানেন না। এমনকি কীভাবে অংশগ্রহণকারীদের মতামত লিপিবদ্ধ করা হয়েছে সে বিষয়টিও পুনরায় তাদের কাছে গিয়ে জানাননি কৌশলপত্র প্রণেতারা। ফলে, যে কথাগুলো খসড়া কৌশলপত্রে স্থান পেয়েছে সেগুলো কার কথা সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না। এই সব দুর্বলতার আলোকেই আমরা আশা করেছিলাম যে খসড়াপত্রটি যখন চূড়ান্ত করা হবে তখন যেন জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণের ভিত্তিতে তা করা হয়। আমরা নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে তাই প্রস্তাব করেছি যে, ব্যাপক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে যেন পিআরএসপি টাস্কফোর্স/স্টিয়ারিং কমিটি গঠন বা পুনর্গঠন করা হয়। সরকার যেন পিআরএসপি প্রস্তুতি পর্বে সহায়কের ভূমিকায় থাকে। তারা যেন তাদের কর্তৃত্ব জাহির করতে গিয়ে জনগণের অংশগ্রহণের স্বতঃস্ফূর্ততায় বিঘ্ন না ঘটায়। আর সে কারণেই আইপিআরএসপি প্রণয়ন প্রক্রিয়ার অভিজ্ঞতাটি দ্রুত সার-সংক্ষেপ করে সকলের মাঝে ছড়িয়ে দেয়া উচিত ছিল। যে ভুলগুলো আমরা খসড়া পিআরএসপি প্রণয়নের সময় করেছিলাম সেগুলো যেন পুনরায় না করি সে জন্যেই এ কাজটি এমন জরুরী হয়ে পড়েছে। প্রাথমিক স্টক হোল্ডারদের সঙ্গে আলাদা কলসাল্টেশন আয়োজনের প্রয়োজন রয়েছে। যেমন দরিদ্র (পুরুষ ও নারী), চরম দরিদ্র (পুরুষ ও নারী), অসহায় জনগোষ্ঠী, বড় ও মাঝারি কৃষক, ক্ষুদে ও প্রান্তিক কৃষক, ভাগচাষী, শিল্প শ্রমিক (বৃহৎ ও ক্ষুদে), পরিবহন শ্রমিক (যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক), ব্যবসায়ী (বৃহৎ ও ক্ষুদে), শহর ও গ্রামের দিনমজুর, মহানগরের নির্মাণ শ্রমিক, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, প্রতিকূল পরিবেশে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের সমস্যা, চাহিদা, সম্ভবনা নিয়ে আলাদা আলাদাভাবে নিবিড় আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। তাছাড়া এসব মতামত সৃষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করে স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় বিচার বিশ্লেষণ করে কৌশলপত্রে উপস্থাপন করার প্রয়োজন রয়েছে। চূড়ান্ত প্রতিবেদনটির যাতে একটি জাতীয় মালিকানা থাকে সে জন্যে সকল রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি, বিশেষ করে জাতীয় সংসদে বিস্তারিতভাবে আলোচনা-পর্যালোচনা করার প্রয়োজন রয়েছে। দাতারা যেহেতু এই দাবিটি করেছে তাই ‘আশা’ করা যায় এবারে সরকার বিরোধী দলের সঙ্গে এই কৌশলপত্রটি নিয়ে আলাপ করবে। এই জায়গাটাই আমাদের দৃষ্টিতে খুবই দুঃখজনক বলে মনে হয়। এদিন ধরে আমরা দাবি করে আসছিলাম যে, বিরোধী রাজনীতিকদের সঙ্গে, সংসদ সদস্যদের সঙ্গে দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র নিয়ে কথা বলুন। কিন্তু নাগরিক সমাজের এ দাবির দিকে তাকানোর সময় ছিল না সংশ্লিষ্টজনের। যেই না দাতারা দাবি করল অমনি রাজি হয়ে গেলেন তাঁরা। তাহলে যে জনগণ এদেশের মালিক তাঁদের চেয়েও কি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে দাতারা? অবশ্য দাতাদের সমালোচনারও যথেষ্ট ভিত্তি ছিল। বিশেষ করে দুর্নীতি ও আইনশৃঙ্খলা নিয়ে তাদের উদ্বেগের সঙ্গে দেশবাসীও একমত।

এমনি এক বাস্তবতায় আমাদের সুস্পষ্ট প্রত্যাশা যে, শুধুমাত্র দাতাতের সন্তুষ্টির জন্যে নয়, সত্যিকার অর্থেই পিআরএসপিকে একটি জাতীয় দলিল হিসাবে প্রণয়নের প্রক্রিয়ায় রাজনীতিক, ব্যবসায়ী, এনজিও এবং নাগরিক সমাজের সকল প্রতিনিধি এবং গরিব মানুষের সরাসরি অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার রাজনৈতিক অঙ্গীকার সরকারকে কার্যক্ষেত্রে দেখাতে হবে। তা না হলে এটি একটি সুলিখিত কাগজ হিসাবেই নীতিনির্ধারকদের শেক্ষের শোভা বর্ধন করে চলবে। পাশাপাশি, রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় গণতন্ত্রায়নও সাধারণ মানুষের জীবন জীবিকার অধিকারকে প্রস্তাবিত কৌশলপত্রের মৌলিক বিষয় করতে হবে। তা করতে হলে দুর্নীতি দমন কমিশন কার্যকর করা, ন্যায়পাল নিয়োগ করা, বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ, সরকারী খরচ কমিশনের প্রস্তাবাবলী দ্রুত বাস্তবায়নে উদ্যোগী হতে হবে সরকারকে। আমাদের যা নেই সে নিয়ে হাপিতোস না করে আমাদের যা আছে তাকে কেন্দ্র করেই সামনের দিকে এগুতে হবে। আমাদের কৃষক ক্ষুদে উদ্যোক্তা, বস্ত্র শিল্পোদ্যোক্তা, এনজিও খাত যে সাফল্যের গাথা রচনা করেছে সেসব থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের মতো করে জাতীয় দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র প্রণয়নে উদ্যোগী হতে হবে। শুধু প্রণয়ন করলেই চলবে না, এই কৌশলপত্র যাতে ঠিকঠাক বাস্তবায়িত হয় তা সর্বক্ষণ নজরদারিও করতে হবে জনগণকেই। জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে পিআরএসপি মনিটরিংরের দায়িত্বও নাগরিক সমাজকে গ্রহণ করতে হবে। দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমরাও সফলকাম হব– সেই ভাবটি জাতির হৃদয়ে গেঁথে দিতে হবে। একা সরকার যে তা করতে পারবে না সে সত্যটি মেনে নিয়ে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে এই লড়াইয়ে পুরো জাতিকেই একাট্টা হতে হবে। কিন্তু, সমাজকে রাজনৈতিক বিবেচনায় বিভক্ত করে, শুধু নিজের স্বার্থের কথা ভেবে উদ্যোগী উন্নয়ন সংগঠনসমূহের বিরুদ্ধে নানা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে জাতিকে এক করা যাবে না। খোলা মন নিয়ে স্বদেশের কথা ভেবে সকলে একযোগে কাজ না করতে পারলে দারিদ্র্য নামের যমদূতের মার খেতেই থাকব।

কাজান থেকে লিখছি

শাহরিয়ার কবির

সাম্প্রদায়িক সৌহার্দের অনন্য এক দৃষ্টান্ত তাতারস্তান

তাতারস্তানের প্রধান দুই ধর্মীয় সম্প্রদায় মুসলমান ও খ্রীষ্টান ধর্মীয় নেতারা যেভাবে ধর্মীয় ও সামাজিক উদ্যোগে একে অপরকে সাহায্য করেন, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। কাজানের পেশ ইমাম মনসুর জালিয়ালেদিনভ আর আর্চবিশপ আনাসতাসির সঙ্গে আলোচনার সময় মনে হয়েছে এঁদের জন্মানো উচিত ছিল আফ্রিকা ও দক্ষিণ এশিয়ার সাম্প্রদায়িক সংঘাত ও বিদ্বেষের কোন দেশে। আর্চবিশপ আনাসতাসির দফতরে কয়েকটি আলোকচিত্র এক পাশের টেবিলে ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখা হয়েছে। একটি হলো তাতারস্তানের গ্র্যান্ড মুফতি গুজমান হজরতের সঙ্গে আর্চবিশপ আনাসতাসির। আলোচনার শুরুতেই আর্চবিশপ বললেন, গ্র্যান্ড মুফতি আমার একজন ভাল বন্ধু। প্রায়ই আমরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করি। তাতারস্তানের প্রেসিডেন্ট অনেক সময় আমাদের দু’জনের সঙ্গে আলোচনা করেন। কাজানে বনেদি ধাঁচের এক দোতলা বাড়িতে আর্চবিশপের দফতর। বড় ঘরের দেয়ালজুড়ে যিশু খ্রিস্ট মেরি মাতা ও সাধু-সন্তদের তৈলচিত্র ও আইকন ঝোলানো রয়েছে। শূশ্র্েমণ্ডিত বিরল কেশ হাসিখুশি অমায়িক চেহারার আর্চবিশপের সঙ্গে পরিচয়ের প্রথমে নামের কার্ড চেয়েছি। হেসে আর্চবিশপ বললেন, আমি কার্ড ছাপিনি কারণ কাজানে সবাই আমাকে চেনে। তাঁর নাম আনাসতাসির আগে পরে কিছু আছে কিনা জিজ্ঞাসা করতে আবার হেসে মাথা নাড়লেন– আমাকে সবাই আনাসতাসি নামে ডাকে। আগে বড়সড় একটা নাম ছিল বটে, এখন আমি শুধু আনাসতাসি। উপপ্রধানমন্ত্রী জিলিয়া ভালিয়েভা যেমন বলেছিলেন আর্চবিশপ আনাসতাসিও বললেন, রাশিয়ার ‘ইভান দি টেরিবল’ তাতারস্তান দখল করার আগেও এখানে অর্ধডব্ল চার্চের অবস্থান ছিল, মুসলমানরা কখনও আমাদের ধর্মপ্রচারে বাধা দেয়নি। বারো শ’ বছর আগে বুলগার খানাতের সময় ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম ছিল কিন্তু খ্রীষ্টধর্মের প্রতি কোন বৈষম্যমূলক আচরণের ঘটনা কখনও ঘটেনি। ধর্ম পালনের ক্ষেত্রে বাধা এসেছে কমিউনিস্ট আমলে। তখন শুধু খ্রীষ্টান নয়, মুসলমানরাও একইভাবে রাষ্ট্রীয় পীড়নের শিকার হয়েছে। গোটা তাতারস্তানে কমিউনিস্টদের আমলে মাত্র তেরোটা গির্জা ছিল, এখন গির্জার সংখ্যা এক শ’ পঞ্চাশ। মঠের সংখ্যা আট। ছয়টা পুরুষদের আর দুটো নানদের জন্য।

তাঁকে বিব্রত করার জন্য বলেছিলাম, মুসলমান ও খ্রীষ্টান সংখ্যা প্রায় সমান সমান হওয়া সত্ত্বেও যেখানে মুসলমানদের জন্য রয়েছে তেরো শ’ মসজিদ সেখানে খ্রীষ্টানদের জন্য দেড় শ’ গির্জা কি পরিসংখ্যানগতভাবে বৈষম্যমূলক নয়? বিন্দুমাত্র বিব্রত না হয়ে হেসে ফেললেন আর্চবিশপ। বললেন, মসজিদ বানানো যত সহজ, গির্জা বানানো তত সহজ নয়। এর পর ব্যাখ্যা করে বললেন, গ্রামে অনেক মুসলমান নিজের বাড়ির একটা আলাদা ঘর মসজিদ বানিয়ে ফেলতে পারে, খ্রীষ্টানরা এ রকম পারে না। তাতারস্তানে এখন রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার রয়েছে। রাষ্ট্রপতি মিভিমির শাইমিয়েভের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন আর্চবিশপ আনাসতাসি। রাষ্ট্রপতি নিজে মুসলমান এবং তাতারস্তানে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও কোন ধর্মের প্রতি তার পক্ষপাত নেই। সরকারের প্রধান সব দফতর কাজান ক্রেমলিনে অবস্থিত। মস্কোর ক্রেমলিনের আগে কাজানকা নদীর তীরে এক হাজার বছর আগে বিশাল এলাকা জুড়ে ক্রেমলিন নির্মাণ করা হয়েছে। বাইরের পাঁচিল আর প্রধান ফটক ছাড়া ভেতরে পুরনো আমলের একটা মাত্র ইমারত রয়েছে, বাকি সব নতুন। তাতারস্তানের সবচেয়ে বড় মসজিদ কুল শরিফের ঠিক পাশেই রয়েছে অর্ধডব্ল চার্চ। দুটোই কমিউনিস্ট আমলে ভেঙ্গে ফেলা হয়েছিল। রাশিয়ায় কমিউনিস্ট সরকারের পতনের পর তাতারস্তানে যখন মিভিমির শাইমিয়েভ রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণের পর নতুন করে মসজিদ-গির্জা বানানোর অনুমতি দিলেন তখন

